গণগবেষণা থেকে উদ্যোগ মেলা

মানিক মাহমুদ

কোলকোন্দ ইউনিয়নের গণগবেষকগণ সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা একটি স্থানীয় পর্যায়ে মেলার আয়োজন করবেন। মেলার নাম নির্ধারণ করলেন 'কোলকোন্দ স্থানীয় উদ্যোগ মেলা ২০০৭' সংক্ষেপে 'উদ্যোগ মেলা'। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ মেলা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৭, রংপুরের গঙ্গাচড়া থানার কোলকোন্দ ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে। মেলাটি ছিল একটি দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ। দৃষ্টান্তমূলক এ কারণে, এই মেলায় একইসাথে ঘটেছে 'সমন্বয়, জবাবদিহিতা ও অনুপ্রেরণা'-র সমাহার। প্রত্যাশার সাথে অর্জন মিলিয়ে নিতে গণগবেষকরা মেলা-পরবর্তী পর্যালোচনায় বসেন। তাতে বেরিয়ে আসে যেমন নতুন একাধিক সফলতা ও সম্ভাবনাময় দিক, তেমনি চিহ্নিত হয় একাধিক দুর্বলতা ও ভবিষ্যতের জন্য নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ।

কেন এ উদ্যোগ মেলা?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে একটু পিছনে যেতে হবে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কোলকোন্দ ইউনিয়নে কাজ শুরু করে ২০০৪-এ। শুরু হয় স্থানীয় পর্যায়ে একদল উজ্জীবক[১] সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে। বর্তমানে সেখানে ২৯০ জন উজ্জীবক, এর মধ্যে নারী ১১০ জন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রত্যাশা 'একটি ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনে দেশব্যাপী গণজাগরণ গড়ে তোলা'। এই গণজাগরণের নেতৃত্ব দেন স্থানীয় উজ্জীবক, যাঁরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাব্রতী। তাঁদের এ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তি গভীর দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়বদ্ধতাবোধ। সারাদেশে এমন স্বেচ্ছাব্রতী-উজ্জীবকের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১০০,০০০, এ সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে।

কোলকোন্দ ইউনিয়নের উজ্জীবকরাও তাঁদের ইউনিয়নকে 'ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল' করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ, সংগঠিত এবং তাদের মধ্যে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করে। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 'প্রচলিত দাতানির্ভর উন্নয়ন' এর বাইরে অনেক সম্ভাবনাময় দিক তাদের নজরে আসে। কিন্তু অনেক সম্ভাবনা দেখা দিলেও দেখা যায় ক্ষুধামুক্তির লক্ষ্যে চলমান এই 'গণজাগরণে' সমাজের সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষদের সম্পৃক্ততা নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। অথচ, গণজাগরণ সফল করতে হলে তাতে সমাজের ওই সকল নারী-পুরুষের মালিকানা ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অনিবার্য একটি শর্ত।

ঠিক, এ উপলব্ধি থেকেই কোলকোন্দ ইউনিয়নে গণগবেষণা শুরু হয়, ২০০৫-এর মার্চে। গণগবেষণা অনুশীলন আরম্ভ করেন স্থানীয় সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত একদল নারী-পুরুষ, যাঁরা গণগবেষক হিসেবে পরিচিত হন। তাঁদের এ অনুশীলন থেকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট দ্রুতই এ অভিজ্ঞতা অর্জন করে যে, 'গণগবেষণা' সমাজের সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষকে অনুসন্ধিৎসু ও সংগঠিত করার একটি শক্তিশালী ও কার্যকর হাতিয়ার। স্থানীয় অগ্রসর উজ্জীবকগণ গণগবেষণায় 'সহায়ক[২]'-এর ভূমিকা পালন করেন।

গণগবেষণার সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো যৌথচিন্তার অনুশীলন, যার চর্চা হয় স্বাধীনভাবে। এর প্রতিফলন আমরা দেখি গণগবেষকদের পূর্ণ মালিকানায় ও নেতৃত্বে গণসংগঠন গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে। মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় বলেই

---

[১] চার দিনব্যাপী উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে উজ্জীবক সৃষ্টি হয়। এই প্রশিক্ষণে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করে।

[২] এর পর থেকে 'সহায়ক' এর পরিবর্তে একই অর্থে 'এনিমেটর' ব্যবহার করা হবে। 'সহায়ক' কেবল দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ব্যবহার করে। কিন্তু দেশের অন্যত্র এবং দেশের বাইরেও তা 'এনিমেটর' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উজ্জীবক-এর ইংরেজী এনিমেটর। কিন্তু উজ্জীবক অর্থে এখানে এনিমেটর বা সহায়ক বোঝানো হবে না।

গণগবেষকরা বলেন এগুলো 'আমাদের সংগঠন। কারণ এখানে আমাদের চিন্তা, আমাদের অর্থ, আমাদের সিদ্ধান্ত, সবই আমাদের'। কোলকোন্দে এমন গণসংগঠনের সংখ্যা বর্তমানে ২৫টির অধিক। গণসংগঠনগুলোর রয়েছে স্বত:স্ফূর্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড। ফলে দ্রুতই গণগবেষকরা তাঁদের যৌথচিন্তার ফসল 'গণসংগঠন'-এর শক্তি উপলব্ধি করতে শুরু করেন। এই উপলব্ধি থেকেই গণগবেষকরা সিদ্ধান্ত নেন, 'আমরা সবগুলো গণসংগঠনের মধ্যে সমন্বয় ঘটাবো। তাতে আমাদের শক্তি বাড়বে আরো বহুগুণ।' কিন্তু নিজের সংগঠনের বাইরে এসে অন্যদের নিয়ে যৌথচিন্তার কাজটি সহজ ছিল না, ছিল বাধা। এই বাধা মোকাবিলা করতে করতেই গণগবেষকরা উপলব্ধি করেন, কেবল গণসংগঠনগুলোর মধ্যেই নয়, কোলকোন্দ ইউনিয়নের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত সকলের মধ্যেই সমন্বয় জরুরী। কারণ গণগবেষণা করতে করতেই তারা বুঝতে পারেন, অনেক প্রয়োজনীয় কাজ যা জরুরী, অথচ তা কেউই করছেন না, আবার একই কাজ অনেকেই করছেন। আসলে যে কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হওয়া দরকার, তা হচ্ছে না। এ নিয়ে কারো তেমন মাথা ব্যাথাও নেই। ফলে সকলের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটলে হয়তো এই সংকট দূর হবে, এই ভাবনা থেকেই একটি উদ্যোগ মেলা আয়োজনের গুরুত্ব অনুভূত হয়। মেলার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় – কোলকোন্দ ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত সকল সহায়ক শক্তির সুসমন্বয় ঘটানো।' গণগবেষক, উজ্জীবককরা আরো বললেন, 'এ মেলার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অগ্রগতিও উদযাপন করব'। সিদ্ধান্ত হয় মেলার আয়োজক হবে গণগবেষক, উজ্জীবক ও কোলকোন্দ ইউনিয়ন পরিষদ। পরবর্তীতে অবশ্য স্থানীয় সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয় আয়োজন প্রক্রিয়ায়।

একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন?

এখানে যে প্রশ্নটি ওঠা স্বাভাবিক, এতো দ্রুত গণগবেষকরা এ ধরনের সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হলেন? হ্যাঁ, সক্ষম হলেন। কারণ গণগবেষণার সাথে ইউনিয়ন পরিষদ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। গণগবেষণা থেকে 'সমন্বয়' ধারণাটি উঠে এলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তা লুফে নেন। ইউনিয়ন পরিষদ নিজের স্বার্থেই (হয়তো) প্রশাসনকে জড়িত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। এতে অনেকেই এ আশংকা ব্যক্ত করেছেন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যুক্ত হলে তো গণগবেষকদের ভাবনা হারিয়ে যাবার কথা। এমন বিপরীত-স্বার্থের সংমিশ্রণে গণগবেষণা হয় কী করে! আমি তাদের অনেককেই বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি, তাহলে কি গণগবেষকরা প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামোর সাথে কাজ করতে করতে নিজেদের সক্ষমতা বাড়াবে না? এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, গণগবেষকদের একটি যৌথচিন্তাকে ইউনিয়ন পরিষদ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পরবর্তী পর্যায়ে গণগবেষকদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের দূরত্ব যদি বেড়েও যায়, তা হলেও এ অভিজ্ঞতা হবে তাদের জন্য মহামূল্যবান। এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে, তা হলো কোলকোন্দ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিজে উজ্জীবক। উজ্জীবক হবার পর তিনি পুরো ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের উজ্জীবক হতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ইউনিয়নে উজ্জীবক সৃষ্টির দায়িত্ব নেন। ফলে ক্ষমতা কাঠামোর দিক থেকে দূরত্ব থাকলেও গণগবেষণাকে তিনি ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের প্রশ্নে একটি সহায়ক শক্তি হিসেবেই দেখেছেন। বলে রাখা ভালো, এরই মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ একাধিক বিষয়ে গণমুখী সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধও হয়েছে। যেমন, শিক্ষাবৃত্তি, ভিজিএফ কার্ড প্রভৃতি বিতরণের ক্ষেত্রে কাদের অগ্রাধিকার দেয়া উচিত, এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উজ্জীবক, গণগবেষকরা (আংশিকভাবে হলেও) এখন সম্পৃক্ত।

উদ্যোগ মেলার আরো পেছনের কথা

কোলকোন্দে গণগবেষণায় উদ্যোগ মেলার প্রসঙ্গটি ওঠে ২০০৬-এর শুরুর দিকে। কয়েক দফা যৌথচিন্তার মধ্য দিয়ে গণগবেষকরা একমত হন উদ্যোগ মেলা তাঁরা আয়োজন করবেনই। একথা সত্য যে, এই সিদ্ধান্ত প্রথম দিকে ছিল অগ্রসর কয়েকটি গণসংগঠনের। মুক্তিনগর ইউনিয়নের এক গণগবেষক তো বলেই বসলেন, এটা আপনাদের একটা বড় সীমাবদ্ধতা। সবাই আলোচনায় থাকলে আপনাদের এই শক্তি আরো বাড়ত। কিন্তু আয়োজকদের বক্তব্য হলো – "অবশ্যই সীমাবদ্ধতা। তবে এটা আমাদের একটি 'কৌশলগত অগ্রাধিকার', সকল গণগবেষক এখানে না থাকলেও, সকলে বিস্তারিত না জানলেও মেলা আয়োজনে সকলেই আগ্রহী। কারণ আমরা সবাই চাই, গণগবেষণায় ইউনিয়ন পরিষদ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হোক। এতে বড় বড় ঝামেলা সহজেই মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।' তারপরেও কিন্তু মেলার উদ্দেশ্য চূড়ান্ত করতে অনেক সময় ব্যয় হয়। উদ্দেশ্য নির্ধারণ মিথস্ক্রিয়ায় একজন গণগবেষক প্রশ্ন তোলেন – কেবল সম্পৃক্ত সহায়ক শক্তিগুলোর সুসমন্বয় করাই কি এ মেলার উদ্দেশ্য? একদল বলেন, এ পর্যায়ে সুসমন্বয়ই মূল

উদ্দেশ্য। অনেকে দ্বিমত করেন। তাদের যুক্তি অবশ্যই সমন্বয়, তবে মূল উদ্দেশ্য – কোলকোন্দ ইউনিয়নের সার্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণে চলমান গণজাগরণ প্রক্রিয়াকে আরো শক্তিশালী করা। গণগবেষকরা জানান, ইউনিয়ন পরিষদের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকার পরেও, আমরা পাশাপাশি কাজ করতে চাই। কারণ গণগবেষণাকে এরই মধ্যে যারা হুমকি মনে করা শুরু করেছেন, তাদের মোকাবিলা করার মতো শক্তি এখনো আমাদের হয় নি। তাই ইউনিয়ন পরিষদ সাথে থাকলে সে সংকট অনেকখানি আর থাকবে না।

এখানে আমাদের **শিক্ষা** হলো, গণগবেষণার শক্তিকে যদি স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের উপলব্ধিতে আনা যায়, তবে গণগবেষণাকে যারা হুমকি মনে করে, তাদের আক্রমণ ঠেকাতে ইউনিয়ন পরিষদই ভূমিকা পালন করবে, নিজের স্বার্থেই। কারণ আমরা দেখি, চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল বলেন, 'এ উদ্যোগ মেলা আমাদের। আমরা সবাই মিলেই এটা আয়োজন করব। আমি নিজে জেলা প্রশাসন ও সরকারী সেবা দপ্তরগুলোকে উদ্বুদ্ধ করব আমাদের এ উদ্যোগ মেলায় সম্পৃক্ত হতে।'

গণগবেষকরা অনেক **সমালোচনা-আত্মসমালোচনা** করেন। সমালোচনা আসে উদ্যোগ মেলাকে গণগবেষকরা যেভাবে সাজিয়েছেন তাতে স্থানীয় সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে নি। মেলা-পরবর্তী পর্যালোচনা সভায় এ মন্তব্যও এলো, 'মেলায় গণগবেষকের বাইরে স্থানীয় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল খুবই কম'। আরো তীর্যক মন্তব্য করলো রংপুর কারমাইকেল কলেজের একজন ছাত্র 'মেলায় সুবিধাভোগীদেরই প্রাধান্য ছিল। মেলার আয়োজক যে স্থানীয় দরিদ্রতম মানুষরা ছিলেন, তা বোঝাই যায় নি।' এসব মন্তব্য শুনে গণগবেষকদের কেউ কেউ ক্ষেপে উঠেছিলেন। গণগবেষকদের মধ্যে প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মনোয়ারা বেগম 'এ মেলা ছিল আমাদের। সবকিছু আমরা নিজেরাই করেছি। সবগুলো গণসংগঠনের কাজ তুলে ধরতে পারলে ভালো হতো। তাতে আরো মানুষ আসতো। আমরা আসলে সমন্বয় করতে চেয়েছি তো, ... তাছাড়া শেষ দিকে প্রচারটাও ভালো হয় নি।' কয়েকজন একসাথে বলে উঠলেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি – এখন থেকে প্রতি বছরই এ মেলা করব। প্রথমবারতো, অভিজ্ঞতা কম ছিল। তবে সবাই মিলে একসাথে কাজ করেছি, এটা খুব আনন্দের ছিল।' গণগবেষক লাইজু বলেন, 'আমাদের এ অভিজ্ঞতা দেশের জন্য কাজে লাগবে হয়তো, তবে এ মেলা আমরা করছি আমাদের নিজেদের স্বার্থে। ... তবে আসলেই অনেকগুলো ভুল হয়েছে।' প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরের বিনবিনা চর থেকে আসা গণগবেষক রফিকুল ইসলাম, চিলাখাল চরের মিনুল বলেন, 'মনে হচ্ছে ঈদের থাকিয়াও বেশি আনন্দ'। তাঁদের এ অনুভূতির কারণ – এই উদ্যোগ মেলাকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় মেলা ব্যবস্থাপনা দল। উজ্জীবক ও গণগবেষকরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দায়িত্ব নেন স্বেচ্ছায়। গণগবেষকরা নিজেরা বসে পর্যালোচনা করে খুঁজে বের করেন কোন গণসংগঠনের কী শক্তি আর কী দুর্বলতা, সেসব তারা পোষ্টারে লেখেন নিজেরাই।

গণগবেষকদের মধ্যে ভবিষ্যতে যাঁরা এ ধরনের উদ্যোগ নেবেন, তাদের জন্য একটি **শিক্ষা** হতে পারে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি অগ্রগতি, প্রতিটি ভুলভ্রান্তি লিখে রাখার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলে তা হবে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কেননা, উল্লেখিত পর্যালোচনা সভায় দেখা গেছে, অনেকে অনেক কথা মনেই রাখতে পারেন নি, কিংবা একই ঘটনা কয়েকজন একাধিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

মেলার দিনের কথা

মেলা-পূর্ব সমন্বয় সভাতে সিদ্ধান্ত হয়, উদ্যোগ মেলায় স্টল হবে ১৯টি। এর মধ্যে একটি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য, একটি উজ্জীবকদের জন্য, তিনটি গণগবেষকদের জন্য এবং অবশিষ্ট ১৪টি স্থানীয় এনজিও ও সরকারী সেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের জন্য বরাদ্দ হয়। গণগবেষকদের স্টলে ২৫টি গণসংগঠনের ৬৫ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। মেলার আয়োজনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন আরো ৫৭ জন গণগবেষক এবং ৫ জন এনিমেটর (সহায়ক)। মেলা দেখতে আসেন কোলকোন্দ ইউনিয়নের সবগুলো গ্রামের ১,০০০-এর বেশি সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষ, যাঁদের অধিকাংশই গণগবেষক। এঁদের প্রায় ৬০ ভাগই নারী। সর্বোচ্চ উপস্থিতি ঘটে বিকেলে। মেলা দেখতে আসেন জেলা প্রশাসকসহ এক ডজনের বেশি সরকারী ও এনজিও কর্মকর্তা। গণগবেষকদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততার শক্তি পর্যবেক্ষণ করতে রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ্স-বাংলাদেশ (রিইব) এর তিন জন গবেষকও হাজির হয়েছিলেন ওই মেলায়।

উদ্যোগ মেলাকে সাজানো হয় তিন পর্বে। সকাল ৯.০০ টা থেকে ১১.০০ টা পর্যন্ত ছিল কোদাল দিবস উদযাপন[৩]। সকাল ১১.০০ টা থেকে ৩.০০ টা পর্যন্ত ছিল গণগবেষকদের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পর্যালোচনা পর্ব। এ পর্বে গণগবেষকরা ব্যাখ্যা করেন তাঁরা কিভাবে যৌথচিন্তার অনুশীলন করছেন, যৌথচিন্তা করে নিজেদের মধ্যে কী নতুন শক্তির সন্ধান পেয়েছেন, নিজেদের পরিবর্তনের জন্য সে নতুন শক্তিকে কাজে লাগাতে গিয়ে কী বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা তাঁরা অর্জন করেছেন। একই পর্বে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ গণগবেষকদের সরাসরি প্রশ্ন করেন এবং তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। উজ্জীবক, ইউনিয়ন পরিষদের সাথে একটি এনজিও ও একটি সরকারী সেবা দপ্তরও তুলে ধরেন তাদের ভূমিকা। বিকাল ৩.০০ টা থেকে ৪.০০ টা পর্যন্ত ছিল স্থানীয় এনজিও ও সরকারী সেবা দপ্তরসমূহের 'কী করেছেন ও কী করবেন' পর্ব। এ পর্বটি ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এনজিও ও সরকারী সেবা দপ্তরগুলো তুলে ধরেন তারা কী করেছেন, তারা একের পর এক সফলতা তুলে ধরতে শুরু করলে অধিকাংশরাই তীব্র প্রশ্নের মুখোমুখি হন। গণগবেষকরা প্রশ্ন করেন, এতো যে সব সফলতার কথা বলছেন এগুলো কি আমাদের এলাকার? আমরা তো এমন সুবিধা পাই নি। এনজিওরাও প্রশ্নের মুখে পড়েন, একই কাজ সবাই করছেন কেন? গণগবেষকরা প্রশ্ন করেন, আমাদের গ্রামে আমরা আর চড়াসুদে ক্ষুদ্রঋণ চাই না। আমাদের সঞ্চয়ের টাকায় আমরা চলব – তারপরেও কি আমাদের গ্রামে আপনারা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালিয়েই যাবেন? এর উত্তর মেলে নি। বিকাল ৪.০০ টায় শুরু হয় গণগবেষকদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা চলে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একটি নাটিকাও প্রদর্শন হয়। নাটিকার বিষয় ছিল যৌতুক ও বাল্য বিবাহের কূফল।

'এতো সেবা আমাদের জন্য!'

গণগবেষক ও উজ্জীবকদের বিশেষ জানার আগ্রহ ছিল সরকারী সেবা দপ্তরগুলোর কী সেবা রয়েছে এবং তা সহজে পাবার উপায় কী? অনুরোধের প্রেক্ষিতে সরকারী একটি সেবা দপ্তর তুলে ধরে তারা কী করছে আর কী তাদের সেবা রয়েছে। তাদের বর্ণনা শুনে গণগবেষকরা বিস্ময় প্রকাশ করে জানান – 'এতো সেবা আমাদের জন্য'! গণগবেষকদের বিস্ময় দেখে উপস্থিত জেলা প্রশাসক নিজেও বিস্মিত হয়ে বলেন, আমাদের মধ্যে এতো সমন্বয়হীনতা! এতো প্রশ্ন করেও গণগবেষকদের ক্ষোভ যে মেটে নি তার আভাস পাওয়া গেল পর্যালোচনা সভায়। এখানে গণগবেষকরা আত্মসমালোচনা করে বলেন, 'আমাদের আরো কৌশলী প্রশ্ন করা উচিত ছিল যাতে অন্যরা গুরুত্ব অনুভব করতো – আমাদের (জনগণের) কাছে জবাবদিহি করাটা তাদের একটি দায়িত্ব। তাছাড়া তারা কী করবেন এ নিয়ে বিস্তারিত আলাপই হয় নি। আমরাও এ নিয়ে তেমন প্রশ্ন তুলি নি। এটা আমাদের একটি বড় দুর্বলতা ছিল।'

যৌথচিন্তার শক্তির বর্ণনা

উদ্যোগ মেলায় গণগবেষকরা তাঁদের অগ্রগতির বর্ণনা দেন, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁরা জানান, গণসংগঠনগুলোই আমাদের শক্তি, শক্তির উৎস। গণসংগঠনগুলোতে যে সঞ্চয়[৪] জমেছে, তা তাঁরা বিনিয়োগ করেছেন নিজেরা একক ও যৌথ আয়মুখী উদ্যোগে। এর ফলে তাঁদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল হবার গতি বেড়েছে যে কোন সময়ের থেকে বেশি। এর ফলে সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে এনজিওদের চড়া সুদে 'মহাজনী' ক্ষুদ্রঋণ নেবার প্রতি অনাগ্রহ। আগে যারা ক্ষুদ্রঋণ নিতো, তারা তো এখন নেয়ই না, উল্টো এই ব্যবসার (তাদের ভাষায়) ফলে আরো দরিদ্র মানুষ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্যে তাঁরা এ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে তৎপর। গণগবেষকদের মতে – নিজেদের টাকা নিজেদের বুদ্ধি থাকতে কোন দুঃখে মহাজনী ঋণ নেব আমরা?

শুধু অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নয়, কোলকোন্দে যে সামাজিক শক্তি গড়ে উঠছে, তারও বর্ণনা দেন গণগবেষকরা। অবশ্য মুক্তিনগরের মতো 'আর বাল্য বিবাহ নয়' এমন ঘোষণা কোলকোন্দ থেকে এখনো আসে নি। তবে কোলকোন্দের সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত মানুষ চর এলাকায় তিন লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে আর স্বেচ্ছাশ্রমে তিন কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করেছেন। এর ফলে সেখানে ছোট পরিসরে হলেও মঙ্গার প্রভাব যেমন কমেছে, তেমনি 'আত্মবিশ্বাস' সৃষ্টি হয়েছে আরো বড় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করার। এ অভিজ্ঞতা অন্যদের মধ্যে সাহস সঞ্চারিত করে।

---

[৩] গণগবেষকরা জানান, কোদাল দিবস উদযাপন উদ্যোগ মেলার অংশ নয়। তারপরেও একই দিনে এ অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে নিজেদের এবং অতিথিদের সময় বাঁচাতে। কোদাল দিবস এ বছর দ্বিতীয়বারের মতো উদযাপিত হলো। গত বছর ১২ ফেব্রুয়ারী প্রথম এ দিবস উদযাপিত হয়। তখনো উদ্যোগে মেলা জাতীয় কোন ধারণা কোলকোন্দে সৃষ্টি হয় নি।

[৪] বর্তমানে গণসংগঠনগুলোর মোট সঞ্চয় চার লক্ষাধিক টাকা।

গণগবেষণায় সিদ্ধান্ত হয় – একটি সমন্বিত সারের আড়ত গড়ে তোলা হবে। এর উদ্দেশ্য – আবাদের মৌসুমে তারা আর ঠকতে চায় না। নিজেদের গড়া প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেরা সার কিনবে। এতে অন্য কেউ দামে ঠকাবার সুযোগ যেমন পাবে না, তেমনি সময় মতো সার সংগ্রহ করতে পারবে। গণগবেষকরা বলেন, এতে 'আসলও নিজের, লাভও নিজের'। এমন পরিকল্পনার কথাও মেলায় তুলে ধরা হয়।

কোদাল দিবস উদযাপন

কোলকোন্দে সামাজিক উদ্যোগ বিশেষ করে স্বেচ্ছাশ্রমের একটি দৃষ্টান্ত হলো এই কোদাল দিবস উদযাপন। কোদাল দিবস অনুষ্ঠিত হয় উদ্যোগ মেলার দিনে, শুরুতেই। এ উপলক্ষে কোলকোন্দ ইউনিয়নের ৩০০-এর বেশি নারী-পুরুষ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে মাটি কেটে রাস্তা সংস্কার করেন। গণগবেষক, উজ্জীবক সাধারণ গ্রামবাসী সবাই কোদাল ও টুকরি নিয়ে এসে মাটি কাটায় অংশ নেন। চেয়ারম্যান জানান, স্থানীয় একটি প্রশস্ত রাস্তা, ছোট আরো দু'টি রাস্তা সকলের স্বেচ্ছাশ্রমে আমরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে সংস্কার[৫] সম্পন্ন করি। এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদের সাশ্রয় হয় প্রায় ১,০০,০০০ টাকা। অনেকে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছেন যাঁদের আসলেই স্বেচ্ছাশ্রম (সময়) দেবার সামর্থ্য ছিল না। পরে আলাপ করে জানা যায়, এ ধরনের আরো অনেকে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে পারেন নি, সে জন্যে তাঁরা এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাঁদের শ্রম বিক্রি করতে অন্যত্র দূরে যেতে হয়। তারপরেও যাঁরা এসেছিলেন তারা দ্রুত (সাধ্য মত সময় দিয়ে) চলে গেছেন। অনেক নারী ছিলেন স্বেচ্ছাশ্রম দিতে আগ্রহী কিন্তু তারা পুরুষের বাধার কারণে এ কাজে যুক্ত হতে পারেন নি। হাইস্কুলের এক শিক্ষক আমাকে জানিয়েছেন, 'আমার ছাত্রী তিথি আমাকে বারবার অনুরোধ করেছে, আমি তার বড় ভাইকে বোঝাই যেন তাকে মাটি কাটতে যেতে দেয়। তিথিকে আমি স্বেচ্ছাশ্রম দেবার সুযোগ করে দিতে পারি নি। তাতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে।' তাঁর (শিক্ষক) সেই কষ্টের বর্ণনা আমাকে এক অজানা আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে এটা মনে হয় বলা যায়, কোদাল দিবস উদযাপন কেবল স্বেচ্ছাশ্রম দেয়া নয়, তা এক আনন্দের, এক ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতাবোধ সৃষ্টির দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। সে কারণেই স্বত:স্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্ত বেড়িয়ে এসেছে 'আমরা এখন থেকে প্রতি বছরই কোদাল দিবস উদযাপন করব'।

এই সফলতা, দৃষ্টান্ত ও আনন্দের মধ্যে বেদনাও ছিল। জানালেন গণগবেষক নুরুজ্জামান – কোদাল দিবস আমাদের জন্য একটি আনন্দের দিন, কারণ এতে সবাই স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছে। আমরা সবাইকে স্বেচ্ছাশ্রমে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছি। কিন্তু এবার আনন্দের সাথে একটি বেদনাও যুক্ত হয়েছে। শুধু বেদনা নয়, তা আমাদের জন্য একটি দুর্বলতাও বটে। এ দুর্বলতার কারণ হলো কয়েকজন মেম্বর। তারা তাদের 'পকেটের' কিছু মানুষকে মাটি কাটতে আসতে বলেছেন। এ সংখ্যা সবমিলিয়ে ১৮-২০ জনের মতো ছিল। যাদের আসলে স্বেচ্ছাশ্রম নয় মাটি কাটতে আসতে বলা হয়েছে। তারা রাস্তার একপাশে বসেছিল। কেন বসে আছেন জানতে চাইলে তারা জানান কোথায় মাটি কাটব জানি না তো। সাথে সাথে আমরা বিষয়টি চেয়ারম্যানকে জানিয়ে বলি আমাদের তো লোক বেশি দেখাবার দরকার নেই। মেম্বরদের কাছেও আমরা জানতে চাই – এটা আপনারা কেন করলেন? এটা অন্যায়। এটা গণগবেষণার সাথে বেমানান। তাছাড়া এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ততো আমরা নেই নি। মেম্বাররাসহ এতে চেয়ারম্যান নিজেও বিব্রত বোধ করেন। ভুল বুঝতে পেরে তাক্ষণিকভাবে উপস্থিত ১৮ জনকে মাটি কাটতে নিষেধ করেন। অবশ্য তারা তখনও পর্যন্ত মাটি কাটা শুরু করেন নি। পরে তারা ফিরে যান। এখানে যে **শিক্ষাটি** নেবার মতো তা হলো, যৌথচিন্তার সাথে সম্পৃক্ত থেকেও, অনেকে তার স্বভাবসুলভ আচরণ পাল্টাতে পারে না, যা অনেক সময় যৌথচিন্তা বিরোধী হয়ে ওঠে। এর ফলে অনেক ছোট ঘটনার জন্যেও বড় ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে।

আর একটি দুর্বলতার বর্ণনা দিলেন এনিমেটর জোলেখা বেগম 'আমরা রাস্তা ঠিক করেছি দুই তিনটি। দু'টি ছোট একটি বড় রাস্তা। কিন্তু সবাইকে আমরা এটা ঠিকভাবে জানাতে পারি নি। ফলে অনেকেই জানতে চাচ্ছিল কোথায় তারা কাজ শুরু করবে। অনেকে অনেকক্ষণ বসেছিল কোথায় মাটি কাটবে এটা না জানার কারণে। মাটি কাটার সময়ে সমন্বয়টাও ভালো হয় নি। গণগবেষণার সময় এগুলো নিয়ে আলোচনা হলে ভালো হতো।'

[৫] আংশিক সংস্কার করা হয়েছে। কারণ শুধু মাটি কেটে রাস্তায় ফেললেই তাকে পূর্ণ সংস্কার বলা যায় না।

মধ্যবিত্তের অজানা সংকীর্ণতা

আমার এক বন্ধু সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষরা সেদিন বাটে (বেকায়দায়) পড়েছিল। তাদের অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল শত শত মানুষ স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছে, যাঁরা তাদের তুলনায় কয়েকগুণ আর্থিক সামর্থ্যে পিছিয়ে পড়া। কিন্তু এই দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকদের (!) প্রায় ৯৮ ভাগই সেদিন এই স্বেচ্ছাশ্রমে অংশ নিতে পারেন নি। আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা, স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছেন না কেন? এ রাস্তা দিয়ে তো আপনারাও হাঁটবেন। এ প্রশ্নে তারা খুবই বিব্রত বোধ করেছেন। স্বেচ্ছাশ্রম দিতে চান না, ঠিক এমনটা নয়, কিন্তু স্বেচ্ছাশ্রমে অংশ নিচ্ছেন না কেন তার কোন উত্তরও দিতে পারেন নি তারা। কোথাকার যেন এক অজানা সংকট না-কি সংকীর্ণতা তাদের বেঁধে রেখেছে।'

নতুন সম্ভাবনা

জেলা প্রশাসক মন্তব্য করেন – মেলা সম্পর্কে আমার ধারণাই পাল্টে গেল। এই মেলার সবচেয়ে বড় অর্জন হলো 'স্বীকৃতি'। নিজের কাজের স্বীকৃতি নিজেদের কাছ থেকে। স্বীকৃতি অন্য কারো কাছ থেকে পাবার অপেক্ষা ছিল না এখানে। গণগবেষক আর উজ্জীবকরা তাদের নিজেদের পরিবর্তনের দায়িত্ব নিজেরাই নিয়েছেন। এটা খুবই শক্তিশালী একটি দিক। এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'জবাবদিহিতা'। এখানে সমন্বয় ঘটেছে, আমার মনে হয় এখন জবাবদিহিতাও হবে। আমাদের সর্বত্রই সমন্বয়ের অভাব, আমরা ছকে আটকে গেছি। ছকের মধ্য থেকে আসলে 'জনগণ' এর পরিবর্তে 'দাতাদের'ই ক্ষমতায়িত করা হয়। জেলা প্রশাসকের এই বক্তব্যকে 'নতুন সুযোগ সৃষ্টি হলো' বিবেচনা করছেন গণগবেষকরা।

সরকারী সেবা দপ্তরগুলো জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য – উদ্যোগ মেলার ফলে এর একটি প্রাথমিক ক্ষেত্র সৃষ্টি হলো। সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষরা তো এতদিন জানতোই না তাঁদের কী সেবা কখন কিভাবে পাবার কথা। গণগবেষকরা বলেছেন, এখন আমরা গিয়ে জিজ্ঞেস করবো, ন্যায্য প্রশ্ন করবো, কিসের ভয়, প্রশ্ন করা আমাদের অধিকার। অলসতা করলে জানতে চাইব – এত সময় লাগছে কেন? প্রশ্ন এখন আমরা চেয়ারম্যানকেও করব। গণগবেষকদের মতে, দায়িত্ব থাকলে জবাবদিহিতা থাকতেই হবে। এই যে তাদের অধিকার-সচেতনতা, এটাই হলো নতুন সম্ভাবনা, নতুন শক্তি। এ শক্তির বলে প্রচলিতভাবে বিবেচিত **দরিদ্রতম মানুষটিরও ক্ষমতা কাঠামোকে প্রশ্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হলো।**

মেলার আয়োজনকে ঘিরে একাধিক সফলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়। এনিমেটর (সহায়ক) আব্দুল হালিমের প্রশ্ন, 'জবাবদিহিতা আমাদের জন্যও দরকার, আমরা কি সত্যিকারের এনিমেটর হয়ে উঠতে পারছি? আমরা কি আসলেও গণউদ্যোগে পথের বাধা সরাবার কাজ করতে পারছি? হালিম এই প্রশ্ন তোলেন মেলা-পরবর্তী পর্যালোচনা সভায়। হালিমের প্রশ্নের সূত্র ধরে একজন গণগবেষক বলে ওঠেন – কোন কোন এনিমেটর 'সাহায্য' করার চেষ্টা করেন। এ ধরনের সাহায্যকারীরা 'শেখাবার' চেষ্টা করেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। এই গণগবেষকের সাথে একমত হয়ে পরে অনেকেই মন্তব্য করেন, এনিমেটরকে কেবল সহায়তাই করতে হবে। কারণ 'কেউ কাউকে শেখাতে পারেন না, যার শেখা তাকেই শিখতে হয়'। এই উপলব্ধির মূল্য অনেক। এই উপলব্ধি ছাড়াও, এই সাহায্যকারীরা আন্তরিক থাকলেও, তাদের ওপর এক ধরনের নির্ভরশীলতা গড়ে ওঠে, যা মুক্তভাবে যৌথচিন্তার বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

উদ্যোগ মেলা আয়োজনে যতোই গণগবেষকদের সম্পৃক্ততা থাক, তবুও মেলার অবকাঠামো দেখে কিন্তু মনে হয় নি এটা সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের মেলা। বাইরের যে কারো পক্ষে এই মন্তব্য করাই সহজ ছিল যে, 'এখানে মধ্যবিত্তদেরই প্রাধান্য'। হয়েছেও তাই। কারণ মেলার উদ্দেশ্য 'সমন্বয়' হওয়ায় ১৪টি স্টলই ছিল এনজিও ও সরকারী সেবা দপ্তরের জন্য। এই সকল স্টলে যারা বসেছিলেন তারা নিজেরাও ছিলেন তথাকথিত 'ভদ্রলোক'। মাত্র তিনটি গণগবেষণা-স্টলে বসেছিল হতদরিদ্র পুরানো শাড়ি আর লুঙ্গি পড়া নারী-পুরুষ। এসব দেখে বহিরাগত একাধিক ব্যক্তি এমনকি গবেষকরা পর্যন্ত এমন মন্তব্য করলেন, 'এটা দরিদ্র মানুষের মেলা হয় কিভাবে? এটাতো চেয়ারম্যানের চাপিয়ে দেয়া একটি উদ্যোগ।' তাদের এ মন্তব্য শুনে পরে গণগবেষকরা জানান, 'কারো চাপিয়ে দেয়া হবে কেন, আমরা তো আমাদের সুবিধার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পরের বছর হয়তো আর এমনভাবে সমন্বয় করতে হবে না। তখন মেলায় শুধু আমরাই বসব।' সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, এই যে **স্বাধীনভাবে স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ**, যৌথচিন্তার আসল শক্তিতো এখানেই।

ছড়িয়ে পড়েছে অনুপ্রেরণা

উদ্যোগ মেলা দেখতে এসেছিলেন রাজশাহীর সরদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান তপন। তার মধ্যে এতোটাই অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে, তিনিও উদ্যোগ মেলা আয়োজনের আগ্রহ দেখান। ফিরে গিয়ে তিনি স্থানীয় উজ্জীবক, গণগবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করেন এবং সকলের মত অনুযায়ী গত ২৬-২৭ মার্চ সরদহ ইউনিয়নে উদ্যোগ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সরদহের সে মেলায় গণগবেষকদের অংশগ্রহণ ছিল কম। সকল সরকারী সেবা দপ্তর ও এনজিও প্রতিনিধিও আসে নি। উদ্যোগ মেলা নিয়ে গণগবেষণা না হবার কারণে এই ঘাটতিগুলো দেখা দেয়। কিন্তু এখানে একটি নতুন দিক হলো, গণগবেষকরা সুসংগঠিত না হলেও, মেলা নিয়ে যৌথচিন্তা না হলেও, মেলায় বৈচিত্র্য ছিল অনেক। গ্রামের অনেক সাধারণ উদ্যোক্তারা স্টল নিয়ে তুলে ধরেছেন তাদের উদ্যোগ। স্বত:স্ফূর্তভাবেই এটা ঘটেছে। উদ্যোক্তারা বলেছেন, 'আমরা আমাদের কথা বলতে চাই'। এসব দেখে গণগবেষকরা মন্তব্য করেন, আসলে বেশি তাড়াহুড়ো করেছি আমরা। আগামী বছর যাতে গ্রামের আরো উদ্যোক্তারা তাদের উদ্যোগের কথা বলতে পারেন সে জন্যে এখন থেকেই আমরা কাজ শুরু করব।

কোলকোন্দে উদ্যোগ মেলার মধ্য দিয়ে যে শক্তি ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, বোঝা যায় অন্যত্র সে অভিজ্ঞতা তুলে ধরার সময়। যেখানেই এ অভিজ্ঞতা বিনিময় করছি, সেখানেই বিপুল আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। গণগবেষকরা জানাচ্ছেন, 'ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করে আমরা বড় করে মেলা পরে করব, কিন্তু এখন আমরা ছোট করেই (কয়েকটি গ্রাম মিলে) উদ্যোগ মেলার আয়োজন করতে চাই।' জানি না কী ঘটতে যাচ্ছে!

'চেয়ারম্যান বলেন – উজ্জীবকরা, গণগবেষকরা যা করছেন, এসব আমাদের কাজ, তাদের শক্তি মানে আমাদের শক্তি'

আগেই বলা হয়েছে কোলকোন্দ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একজন উজ্জীবক। উজ্জীবক হিসেবে তিনি সক্রিয় ও স্বয়ংক্রিয়। তিনি বলেন, 'আমি মানুষের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি, উজ্জীবক ও গণগবেষকদের সকল ভাবনা, সকল কাজ ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নকে ঘিরেই।' শুধু তাই নয়, 'চেয়ারম্যান বলেন – উজ্জীবক ও গণগবেষকরা যা করছেন, এসব আমাদের কাজ, তাদের শক্তি মানে আমাদের শক্তি।'

আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি, গণগবেষকরা যতো সংগঠিতই হোক, আর তাদের সক্রিয়তা যতো তীব্রই হোক না কেন, ইউনিয়ন পরিষদের সক্রিয় ও স্বয়ংক্রিয় সম্পৃক্ততা ছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ 'গণজাগরণ' এগিয়ে নেয়া কঠিন। উদ্যোগ মেলা আয়োজনে তার প্রমাণ মিলেছে। ইউনিয়ন পরিষদ সম্পৃক্ত ছিল বলে এবং চেয়ারম্যান নিজে মেলা আয়োজনে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন বলে, জেলা প্রশাসন ও সরকারী সেবা দপ্তরসমূহ সম্পৃক্ত হয়েছে দ্রুত। ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততা ছাড়া এ উদ্যোগ মেলায় জেলা প্রশাসককে উপস্থিত করতে কত সময় যে ব্যয় হতো, কিংবা আদৌ তা সম্ভব হতো কি-না, তা বলা যায় না। আর সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তো মনেই করে নি, এ ধরনের গণউদ্যোগে তাদের অংশগ্রহণ জরুরী। উল্টো চেয়ারম্যানের কাছে তারা যাতায়াত ব্যয় চেয়েছিল। চেয়ারম্যানও উল্টো তাদের বলেছেন, 'আপনাদের টাকা দিতে হলে তো আমাকে চাঁদাবাজি করতে হবে'। মানুষের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী না হলে তিনি হয়তো এমন স্পষ্ট কথা বলতে পারতেন না। এসব কথা তিনি যেমন জেলা প্রশাসককে বলেছেন, তেমনি বলেছেন সমন্বয় সভাগুলোতেও। উদ্যোগ মেলাকে ঘিরে কোলকোন্দ ইউনিয়ন পরিষদের এই সক্রিয়তা ও সফলতা অন্যান্য এলাকার গণগবেষকদের মধ্যে এখন একটি নতুন চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে।

'যার ব্যয়, তার দায়'

প্রচলিতভাবে কোন অনুষ্ঠানে 'ব্যয়' যে একটা বড় দুঃশ্চিন্তা এটা বিবেচনাতেই আসে নি এ উদ্যোগ মেলা আয়োজনে। চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে গণগবেষণায় একাধিকবার আলাপ হয়েছে মেলার ব্যয় বিষয়ে। উদ্যোগ মেলার জন্য ব্যয় হয় ৩০,০০০ টাকারও বেশি। ব্যয়ের খাত ছিল – প্রস্তুতি, আমন্ত্রণ, প্রকাশনা, যাতায়াত, আপ্যায়ন, উপকরণ, স্টল সাজানো, সাউন্ড সিস্টেম, ডেকোরেশন প্রভৃতি। কোন সংগঠনকেই সিংহভাগ ব্যয় বহন করতে হয় নি। কারণ যাদের যে ব্যয় তারা তা নিজেরাই বহন করেছে। সিদ্ধান্ত ছিল 'যার ব্যয়, তার দায়'। আপ্যায়ন করা হয় শুকনো খাবার আর খিচুরি দিয়ে। এতে স্থানীয় উজ্জীবক ও গণগবেষকদের অংশগ্রহণ ছিল। অবশিষ্ট ব্যয় বহন করে ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় এনজিও। গণগবেষকদের দিক থেকে ব্যয় ছিল খুবই সামান্য। কারণ তারা সবাই মিলে কাজ ভাগ করে শ্রম দিয়েছে। যাতায়াত করেছে বাই-সাইকেলে, হেঁটে।

চ্যালেঞ্জ

উদ্যোগ মেলার একটা বড় দুর্বলতা ছিল মেলায় এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণ এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা না হওয়া। সময় সমন্বয়হীনতার কারণে গণগবেষকরা তৈরি থাকা সত্ত্বেও বলা চলে ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব করার সুযোগ হয় নি। অথচ কোলকোন্দ ইউনিয়নের একাধিক গ্রামে এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণ বর্তমানে একটি বিরাট সমস্যা। ওই সকল গ্রামের গণসংগঠনগুলো ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে 'আমাদের গ্রামে ক্ষুদ্রঋণের নামে মহাজনী ব্যবসা আর চলতে দেয়া হবে না'। এ প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। এতদিন এই সকল সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষরা দেখতে পান নি, একসাথে মাথা খাটিয়ে নিজেদের মধ্যে 'একতা' গড়ে তুললে, নিজেদের সঞ্চয় থাকলে, এর শক্তি কত বেশি। এখানে চ্যালেঞ্জের দিকটি হলো বর্তমানে যারা ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি শোধ করতে করতে একাধিক এনজিওর 'ক্ষুদ্রঋণের জালে' আটকে পড়েছেন, তারাও নিজেদের মধ্যে গণগবেষকদের মতো সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। গণগবেষকদের মতে, 'এটা এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণের সর্বনাশ ডেকে আনবে। তবে তাদেরও সহজে ছাড়ার কথা নয়। কারণ এটা তাদের ব্যবসা।'

গণগবেষকদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনগণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। চেয়ারম্যান নিজেও বলেন, আমি গণগবেষক নই, গণগবেষণা-সমর্থক। তার আচরণ, কিছু গুণের কারণে তিনি একাধিকবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন এবং তিনি এলাকায় বেশ জনপ্রিয়। তবুও এখানে কিছু সতর্কতাকে বিবেচনায় নিতে হবে। চেয়ারম্যান যতোই বলুক তিনি জনগণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী, ইতিমধ্যে তিনি তার প্রমাণও রেখেছেন, তারপরেও এটা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, এটা তার স্থায়ীভাবে ক্ষমতা হাতে রাখার একটি কৌশল। তিনি নিশ্চয়ই এটা উপলব্ধি করেছেন, গণগবেষণার মধ্য দিয়ে যে শক্তি তৈরি হয় তা পক্ষে থাকলে তার আরো জনপ্রিয় হওয়া সহজ হবে। অন্যদিকে একজন চেয়ারম্যান মধ্যবিত্ত শ্রেণীচেতনা ধারণ করে (প্রায়) ক্ষমতাহীনদের পক্ষে কতদূর রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অনমনীয় থাকতে পারবেন!

কোলকোন্দ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গণগবেষণা-সমর্থক। এটা আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি যদি তা নাও হন তাহলেও গণগবেষকদের সাথে তার সক্রিয় সম্পৃক্ততা জরুরী। কারণ চেয়ারম্যান বাধা দিলে গণগবেষণা শুরুতেই থেমে যাবে। গণগবেষণা কোন প্রজেক্ট নয় যে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হবে। এটা একটি রূপান্তরের প্রক্রিয়া, চলতেই থাকবে। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে, বিশেষ করে গণসংগঠনগুলোর নিজেদের শক্তি অনেকখানি বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানকে কৌশলগতভাবেই হ্যান্ডেল করতে হবে। অন্যথায় দানা বাঁধার আগেই গণগবেষণা অঙ্কুরেই ধ্বংস হতে পারে।

এনিমেটরদের মতে, প্রচলিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মানুষকে সংগঠিত করার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তারা জানতে চায় – তাদের কী লাভ, তারা কী পাবে? গণগবেষণাতেও এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। তবে গণগবেষণায় সুবিধার দিক হলো এখানে যৌথচিন্তার অনুশীলন থাকায় দ্রুতই অর্জনের ওপর সংশ্লিষ্টদের মালিকানা ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এই মালিকানা ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে দরকার পড়ে একদল এনিমেটরের, যাঁদের লেগে থাকতে হয় অনমনীয়ভাবে। চ্যালেঞ্জ এখানেও।

শেষ নয়, শুরু

এই সকল সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ সমাজের সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য খুলে দেবে নতুন সম্ভাবনার দ্বার। যাঁরা এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চ্যালেঞ্জ বুকে নিয়ে এগিয়ে চলবে তাদের ঘটতে থাকবে রূপান্তর। কোলকোন্দ ইউনিয়নের উদ্যোগ মেলা আগামীর জন্য সেই পরিবর্তন আর রূপান্তরেরই হয়তো একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত। তবে এখানেই শেষ নয়, শুরু।

মানিক মাহমুদ : সমন্বয়ক, গণগবেষণা, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

manikswapna@yahoo.com

মার্চ ২৫, ২০০৭